।। প্রথম অধ্যায় ।।

। মধ্যযুগের নাট্যপ্রচেষ্টা ।

১.

বাংলা নাটকের সার্থক প্রবর্তনা ঘটেছে ঊনবিংশ শতকে, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। প্রধানত ইংরেজি Theatre - এর প্রভাবেই যে এর উদ্ভাবনা, সে সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণ অনেকেই স্পষ্ট মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে যে নাটগীতিগুলি রচিত হয়েছিল, লোকসাধারণের মধ্যে যে লোক-নাটগীতি, কথকতা, পাঁচালি, কবিগান, যাত্রা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল- বাংলা নাটকের বীজ হিসাবে এদেরও উপেক্ষা করা ঠিক নয়। বরং এমন কথা বলাই অধিকতর সংগত যে, বাংলা নাটকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে এরাই ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যে নাট্যশ্রেণীর রচনা। কারণ, অন্তত দৃশ্যত্ব, সংলাপধর্মী এবং অভিনেয়তায় এদের নাট্যলক্ষণাক্রান্ত বলে স্বীকার করতেই হবে। নাটকের বীজই বলা যাক আর নাট্যরচনার আদি প্রচেষ্টাই বলি, এই সব প্রয়াসে সংগীতের কী ভূমিকা ছিল সংক্ষেপে সেকথা আমাদের আলোচনা করতে হবে।

বাংলাদেশের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে, রাজরোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য অনেক বাঙালীকে পালিয়ে নেপালে চলে যেতে হয়। সেখানেই তাঁরা বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন, পালাভিনয়ের দৃষ্টান্তও দেখতে পাওয়া যায় সেখানে। এই প্রসঙ্গে নেপালে প্রাপ্ত নেপালী গদ্যে রচিত 'গোপীচন্দ্রের নাটকে'-র উল্লেখ করা

যেতে পারে যার সব গানগুলিই বিশুদ্ধ বাংলায় লেখা । এ বিষয়ের আলোচনা যথাস্থানেই করা হবে । বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন হিসাবে যে চর্যাপদগুলির উল্লেখ করা হয়(দশম-দ্বাদশ শতক), সেগুলিও নেপালের রাজদরবার থেকে সংগৃহীত । ওই সময়ে নাটক অভিনয় হতো, এ প্রমাণ রয়েছে চর্যায়, এবং বলাবাহুল্য, সেই নাটক অভিনয় হতো নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে । এ প্রসঙ্গে চর্যাগীতির ১৭-সংখ্যক পদের উল্লেখ করা যেতে পারে -

''নাচন্তি বাজিল গাঅন্তী দেবী ।
বুদ্ধ-নাটক বিষমা হোই । ।''

চর্যাটির সারসংক্ষেপে দেখা যায় যে, বাজিল(বজ্রাচার্য) নাচছেন, দেবী গাইছেন, এইভাবেই বিপরীত রীতিতে বুদ্ধ-নাটক অভিনীত । দশম সংখ্যক পদটিতে দেখা যায় যে, পদকর্তা, 'ডোম্বী'র জন্যই সংসাররূপ নটপেটিকা ত্যাগ করেছেন -

''তোহোর অন্তরে ছাড়ি নড়পেড়া ।''

কিন্তু মধ্যযুগের নাটগীতির লিখিত কোন পালা ছিল কিনা এবং থাকলে সেগুলি কী ধরণের ছিল, এ সম্বন্ধে মধ্যযুগীয় কাব্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে দেখা যায়, নাটগীত যে ছিল এ সম্বন্ধে অনেক কাব্যে বেশ স্ম স্ম স্প স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে । যেমন কৃত্তিবাসী রামায়ণে দেখি -

''নাটগীত দেখি শুনি পরম কুতূহলে ।
কেহ বেদ পঢ়ে কেহ পঢ়এ মঙ্গলে ।''[১]

কবিরাজ গোস্বামী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শ্রীশ্রী চৈতন্য চরিতামৃত'-তে

চৈতন্যদেব কী ধরণের গ্রন্থের রসাস্বাদন করতেন তার একটি তালিকা দিতে গিয়ে বলেছেন -

''চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ ।''

'রায়ের নাটকগীতি' বলতে বোঝানো হয়েছে রায় রামানন্দের নাটক । রায় রামানন্দ অর্থাৎ রামানন্দ রায় ছিলেন উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপ রুদ্রের(১৪২৮-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) এক ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, ভক্তপ্রবর এবং চৈতন্যদেবের ধর্মালোচনার প্রধান সঙ্গী । তিনি 'শ্রীশ্রী জগন্নাথ বল্লভ' নামে একটি নাটক রচনা করেন । এই নাটক অবশ্য কবি জয়দেবের সংস্কৃতে রচনা 'গীতগোবিন্দের'-ই অনুসরণ বলা যেতে পারে । এই নাটকের বিষয়ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা । তবে 'গীতগোবিন্দ' অপেক্ষা নাট্যলক্ষণ এখানে বেশী । কারণ চরিত্র এখানে আটটি - তিনটি পুরুষ এবং পাঁচটি নারী । সমগ্র আখ্যানটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের মতো পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত - 'পূর্বরাগ','ভাব-পরীক্ষা', 'ভাব-প্রকাশ', 'শ্রীরাধাভিসার' এবং 'শ্রীরাধাসঙ্গম' । এই পালাটির পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন 'সঙ্গীত নাটকম্' বলে । নামেই বোঝা যাচ্ছে, সমগ্র আখ্যানে সংগীতের ভূমিকাই ছিল বেশী । অবশ্য এজন্য একে সংগীতমাত্র মনে করার কোন কারণ নেই - সংগীতের মতোই গদ্য, পদ্য, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা যথেচ্ছ ও যথোপযুক্তভাবে রামানন্দ রায় ব্যবহার করেছেন । তবে সংগীতের ভূমিকা এখানে মুখ্য বলতে

হবে এই কারণেই যে, সংলাপ অংশ কবি রচনা করেছেন সংগীতের মাধ্যমেই।

কবিরাজ গোস্বামীর তালিকায় শেষতম উল্লেখ কবি জয়দেবের 'শ্রীশ্রী গীত গোবিন্দম্' । বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এই সংস্কৃত গ্রন্থখানি কেন অন্তর্ভুক্ত করা হবে সে পুরাতন বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। আপাতত এর নাট্যলক্ষণই আমাদের কৌতূহলের বিষয়।

২.

'গীত-গোবিন্দ' দ্বাদশ সর্গে সমাপ্ত আখ্যানকাব্য। এর শ্রেণী সম্বন্ধে যে বিশাল মতভেদের সমারোহ রয়েছে তার কিছু উল্লেখ করা দরকার। স্বয়ং কবি এই কাব্যকে 'মহাকাব্য' বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। প্রতি সর্গ শেষে তাই উল্লিখিত হয়েছে - ''ইতি শ্রী-গীত-গোবিন্দ মহাকাব্যে।'' 'গীত-গোবিন্দে'র গানগুলিকে তিনি 'মধুর কোমল কান্ত পদাবলী' বলেছেন।

'গীতগোবিন্দকে' মুখ্যত নৃত্য ও গীতাত্মক কাব্য বলে মনে করবার কারণ, পুরী ও তাঞ্জোরের মন্দিরে নৃত্য ও গীতেই যে 'গীত-গোবিন্দ' অভিনীত হতো, তার প্রমাণ রয়েছে। সংস্কৃত নামে 'নৃত্যলক্ষণসহিতং গীতগোবিন্দ মহাকাব্যম্' হিসাবে উল্লিখিত হলেও যে মহাকাব্য নৃত্য-গীতের মাধ্যমে পরিবেশিত হয় তাকে 'নাট্যকাব্য' বলাই যুক্তি-সংগত। বাসুদেব শাস্ত্রীও একে 'Drama with Abhinaya' বলেছেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেও 'গীত-গোবিন্দ'

নৃত্য-গীত-নাট্যরূপেই পরিচিত ছিল।

লসন(C. Lassen) একে কাব্যনাট্য বলেছেন(Lyric Drama)। এতে যেমন উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা আছে, তেমনি কৃষ্ণ-রাধা-সখীর গীতি-সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিণতিতে পৌঁছেছে।

উইলিয়াম জোন্স(William Jones) একে রাখালিয়া নাটক বা Pastoral Drama বলেছেন। অর্থাৎ এটি লোকনাট্যের পর্যায়ে পড়ে এবং এ থেকেই যাত্রার উদ্ভব ঘটেছে বলে অনেকে মনে করেন।

লেভি(S. Lévi) একে 'Opera' বা গীতিনাট্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন।

পিশেল(R. Pischel) বলেছেন 'Melodrama'। অবশ্য শব্দটি পিশেল অতিনাটকীয় বোঝাতে ব্যবহার করেননি, সংগীতবহুল নাটক হিসাবেই এই পরিচিতি দিয়েছেন।

শ্রোয়েডর(Von Schroeder) একে মার্জিত-যাত্রা(Refind Yatra) বলে মনে করেছেন।

'গীত-গোবিন্দ'কে কৃষ্ণযাত্রার আদিরূপ বলে অনেকেই মেনে নিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে ম্যাকডোনেলের(A.A. Macdonell) মতটি উল্লেখ্য - "The transitional stage between pure lyric and pure drama is represented by the Gitgobinda or Cowherd in Song is lyrical drama which though dating from the twelfth century, is the earliest literary specimen of a primitive type of play that still survives in Bengal, and must have preceded the regular dramas." [2]

দেখা যাচ্ছে ম্যাকডোনেলও একে জোন্সের মতো রাখালিয়া নাটক - 'Cowherd in Song' এবং লসনের মতো 'Lyric Drama' বলে চিহ্নিত করেছেন।

কীথ্(A.B. Keith) সাহেবও প্রায় একই মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতে কৃষ্ণ-গোপীলীলা নিয়ে লোক-নাট্যাদি প্রচলিত ছিল যার কিছু নিদর্শন 'গীত-গোবিন্দ'-এ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "And in Jayadeva's Citgobinda we have in literary form the expression of the Yātrā, lyric songs, to which must be added the charms of music and the dance." ৩

'গীত-গোবিন্দে'-র শ্রেণী নির্ণয়ে আমাদের দেশের বিদগ্ধজনের মতামত বিশ্লেষণ করা যাক।

ড. সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় 'গীত-গোবিন্দ'কে যাত্রার পর্যায়ে না ফেলে একে কাব্য বললেও পরবর্তীকালে 'গীত-গোবিন্দ' যে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে দেবদাসীদের দ্বারা মন্দিরে পরিবেশিত হতো একথা স্বীকার করেছেন।

ড. সুশীল কুমার দে 'গীত-গোবিন্দে'র আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য দেখে - এগুলি যে গান করবার উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, 'পদম'-এর শীর্ষে রাগ ও তালের উল্লেখে তাই সূচিত করে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

ড. সুকুমার সেনও সংগীতের প্রাধান্যের জন্য একে 'নাট্যগীতি'-ই বলতে চেয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতামতটি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে -

> ''সব দিক বিবেচনা করে এবং কিছু সন্দেহের অবকাশ রেখে বলা যেতে পারে, 'গীত গোবিন্দ' মূলত: কাব্য, তবে এর আকার প্রকার নাটগীত বা যাত্রাগানের চেয়ে আবৃত্তি-গীতাত্মক পাঁচালীর অধিকতর নিকটবর্তী। পরে এর নৃত্যগীতাত্মক আবেদন শ্রোতৃমনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।''[৪]

এই মতামত থেকে 'গীতগোবিন্দে'র নাট্যলক্ষণ সম্বন্ধে নি:সংশয় হওয়া যায়। কয়েকটি চরিত্র এখানে আছে এবং তাদের সংলাপের মধ্যে কিছু নাটকীয়তা আছে, সে কথা আমরা লক্ষ্য না করে পারিনা। নাটকের সুস্পষ্ট কাহিনী, তার বিবর্তন এবং অনিবার্য পরিণতি এখানে নেই বটে, কিন্তু রাধার প্রেমবিহ্বলতার মধ্যে নাট্য-কাহিনী ও তার বিবর্তনের একটি আভাস আছে, অষ্টম সর্গে রাধার কৃষ্ণ প্রত্যাখানের মধ্যে নাটকীয় উত্থান-পতনও আছে, যদিও সমগ্র আখ্যানই এখানে গীতবদ্ধ।

'গীত-গোবিন্দ' সম্বন্ধে নাটত্বের দাবী যেমন প্রবল, প্রায় সেরকমই প্রবল তার সাংগীতিক আবেদন সম্বন্ধেও। পরিমাণে যে খুব বেশী সংগীত কবি জয়দেব লিপিবদ্ধ করেছেন এমন নয়, দ্বাদশ সর্গ সমন্বিত এই গ্রন্থে গীতের সংখ্যা ছিল চব্বিশ। এই গীতগুলি নিয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, সংগীত শাস্ত্রী।[৫] এতে তিনি দেখিয়েছেন, মোট বারোটি রাগে

এই গানগুলি গাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - গুর্জরী, দেশবরাড়ী, বসন্ত, রামকিরী, মালবগৌড়, কর্ণাট, দেশাখ, গোন্ডকিরী, মালব, ভৈরবী, বরাড়ী ও বিভাস। তাল ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ রকম - যতি, একতালী, রূপক, নিঃসার ও অষ্টতাল। রাগ ও তালের এই নির্দেশ অবশ্য অভিনব বলা যায় না, চর্যাপদেও আমরা পদের শীর্ষে এই রকম রাগ ও তালের উল্লেখ দেখেছি।

বস্তুত, জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'কে আমরা নিঃসংশয়ে নাটক বলতে পারিনা একথা ঠিক। আবার সম্পূর্ণত এ'কে সাংগীতিক আলেখ্য বলাও হয়তো ঠিক হবেনা। আমরা মনে করি 'গীত-গোবিন্দ' সেই আলো-অন্ধকারের সাহিত্যকীর্তি যখন গীতের খোলস ভেঙে নাট্যশিল্পের সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটেনি। সেই মিশ্র প্রকৃতির উৎকৃষ্ট সাহিত্য-নিদর্শনই রেখে গেছেন কবি জয়দেব।

৩.

'গীত-গোবিন্দে'র আলোচনার পর অনিবার্যভাবেই আসে বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র প্রসঙ্গ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নাটগীতি শ্রেণীর রচনা। নাটগীত বলতে XXXX সাধারণত নৃত্যযুক্ত গান বোঝানো হয়ে থাকে। অনেকে এর নাটকীয় গুণ লক্ষ্য করে একে যাত্রার পূর্বরূপ বলে স্বীকার করেন। প্রকৃতপক্ষে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আখ্যানকাব্য হলেও নাটকীয় রীতিতে রাধা-কৃষ্ণ-বড়াই এর উক্তি-প্রত্যুক্তি গানের আকারেই পরিবেশিত। এই কারণে অনেকে একে

'ঝুমুর গান', উত্তরবঙ্গের 'জাগের গানে'র সঙ্গেও তুলনা করেন। কাব্যটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এর তেরোটি খন্ড প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ, যদিও প্রতিখন্ডের সহিত সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন পদধাতির মাধ্যমে। ড. সুকুমার সেন একে,'গীতি-নাট্যকাব্য', 'গীতি-সর্বস্ব নাট্যকাব্য' 'নাট্য-গীতি' এমনকি 'পুতুল নাচের পাঁচালী' হিসাবেও অনুমান করেছেন।

একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সবটাই গীত হতো। প্রত্যেকটি গানের শীর্ষে রাগ ও তালের উল্লেখ একথাই প্রমাণ করে। যদিও কোন-কোন ক্ষেত্রে কবির বর্ণনা, দুজনের সংলাপ ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে - তবুও একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, গানে গানেই কাব্যটি নাটকাকারে পরিবেশিত হতো। কিছু নিদর্শনও দেওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণের উক্তি -

''সিথার সিন্দুর তোর নাসে।
মাথার কেশ সুবেশে।।
আজ্ঞা ছাড়ী জাইবি কোন পথে।
আজি পড়িলা মোর হাতে।।''

এরপরই রাধার ভাবভঙ্গি বর্ণনার পর রাধার গান -

''আল বড়ায়ি।
এগার বৎসরের বালী।'' ইত্যাদি।

তাম্বুলখন্ড থেকে গানের মাধ্যমে উক্তি--প্রত্যুক্তি মূলক নিদর্শনের কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে।

নাতুনী রাধার খোঁজ করতে শ্রীকৃষ্ণের কাছে বড়াই উপস্থিত হয়ে রাধিকার খোঁজ করেন। তারপরই সংগীতের মাধ্যমে চলে

উত্তর-প্রত্যুত্তর -

''কৃষ্ণ - কথাঁ হৈতে আইলা তোহ্নে কিবা তোর কাজে ।
একলী বুলসি কেহ্নে বৃন্দাবন মাঝে ।।

বড়াই - গোঠে হৈতে আসি আমি আহ্মি বুঢ়ী গোয়ালিনী
আগুত চলিলী মোর সুন্দরী নাতিনী ।।'' ইত্যাদি

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' যে নৃত্য ও গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হতো এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই । 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'-এও এর নিদর্শন মেলে -

''দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ ।
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ ।।'

(অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়)

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র সংলাপ ও গান পরবর্তীকালে যাত্রাকে প্রভাবিত করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ।

৪.

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এবং বাংলার সামাজিক জীবনে বিদ্রোহাত্মক । চৈতন্যদেবের দিব্য জীবনের বিশ্লেষণকে অবলম্বন করে জীবনী-সাহিত্যের প্রবর্তনা যেমন ঘটেছে, যাত্রাশালার উদ্ভাবনাতেও তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে বলে আমরা মনে করি । 'কৃষ্ণযাত্রা'-র বিস্তৃত প্রচলন এবং পরে কালীয়দমন পালার উদ্ভবের জন্য তো বটেই, চৈতন্যদেবের জীবনাচরণও ~~কাহি~~-

নাট্যগুণান্বিত ছিল বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই বাংলায় বৈষ্ণবাশ্রয়ী ভক্তি-ধর্মের সূচনা দেখা দিয়েছিল। এই সময়েই মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' রচিত হয়েছে। এরও পূর্বে মাধবেন্দ্র পুরী কৃষ্ণলীলা প্রচার করেছেন। এ থেকে অনুমেয় যে, সেই সময় থেকেই কৃষ্ণলীলাকে অবলম্বন করে, নৃত্যগীতের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলাভিনয় জনচিত্তকে আলোড়িত করেছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তা উত্তাল হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেব স্বয়ং কৃষ্ণলীলাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, এর উল্লেখ 'শ্রীচৈতন্যভাগবত', 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়।

'শ্রীচৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে আমরা 'কৃষ্ণযাত্রা'র উল্লেখ দেখতে পাই -

''কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্র কৃষ্ণ- সঙ্কীর্তন।
ইহার উদ্দেশো নাহি জানে কোনো জন।।''

চৈতন্যদেবের অভিনয়ের আদর্শ কী ছিল তা সঠিকভাবে নির্ধারিত না হলেও একথা বলা চলে যে, নৃত্য ও গীতের মাধ্যমেই সেই অভিনয় সম্পন্ন হয়েছে -

''সুকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি সঙ্গে।
দানখণ্ড নৃত্য করে করে নিজ রঙ্গে।।''

(চৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য, ৫ম অধ্যায়)

কিংবা -

''আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধানে।''

অদ্বৈতাচার্যের উক্তি থেকেও আমরা ওই বক্তব্যের সমর্থন পাই -

''নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর ।
এথায়ে নাচহ-ধন পাইবে প্রচুর ।''

অভিনয় প্রসঙ্গে জানতে পারি, লক্ষ্মীরবেশে চৈতন্যদেব এবং বড়াই বেশে নিত্যানন্দ প্রবেশ করলে 'সময়োচিত গীত' আরম্ভ হয় -

''জগৎজননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর ।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ।।''

অভিনয় এখানেই পরিত্যক্ত হয় । ভাবাবেশে চৈতন্যদেব আত্মহারা হয়ে পড়েন ।

এই অভিনয়ের রূপ ও রীতি পূর্বাপর বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, নৃত্য ও গীতের মাধ্যমেই ওই অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল ।

এরপর বাংলা নাটকের লৌকিক উপকরণ হিসাবে যাত্রা, কথকতা, কবিগান, আখড়াই [illegible] প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য হতে পারে । কিন্তু এগুলি অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাস । মধ্যযুগে আখ্যানকাব্যের যে তিনটি ধারা প্রচলিত ছিল - অনুবাদমূলক, মঙ্গলকাব্য এবং নাথ-সাহিত্য, তাদের মধ্যে নাট্যলক্ষণ নিশ্চয়ই কিছু ছিল । বিভিন্ন সমালোচক ও পন্ডিতগণ সে সব নিয়ে প্রচুর বিশ্লেষণ করেছেন । কিন্তু ভিন্ন প্রকরণে নাট্যলক্ষণ আবিষ্কার করা ও নাট্য-আঙ্গিকে কিছু রচিত হওয়া এক ব্যাপার নয় । এই দীর্ঘ ব্যবধান ও অবকাশ শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, সাহিত্যের ঐতিহাসিক সত্য মেনে চললে, অসম্ভব । এই বিস্ময়কর ব্যবধানের একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, যদি

আমরা 'বৃহত্তর বঙ্গদেশে'-র সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে সচেতন থাকি। এই অনুসন্ধানের সার্থকতা একবার অন্তত প্রমাণিত হয়েছে যখন সপ্তদশ শতকে বাংলা দেশে সাহিত্যসৃষ্টির অভাব আমরা পূর্ণ হতে দেখি ব্রহ্মদেশে মুসলমান কবিদের হাতে।

৫.

মোটামুটিভাবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বাংলায় কোন নাটগীতির নিদর্শন পাওয়া না গেলেও বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলসমূহে কিছু কিছু নাটগীতির নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। নেপাল, আসাম, মিথিলায় প্রাপ্ত এই সকল নাট-গীতির উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা মনে করছি এই কারণে যে, কিছু কিছু নাটগীতিতে বাংলা লিপি ও বাংলা গানের ব্যবহার দেখা যায়। এই সমস্ত নাটগীতি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় নাটকের ধাঁচে লেখা, এতে গানের সংখ্যা প্রচুর এবং গানগুলি অধিকাংশই দেশীয় ভাষায় রচিত। এগুলিকে এই কারণে 'সঙ্গীত-নাটক' বলা হয়েছে। উমাপতি উপাধ্যায় রচিত 'পারিজাতহরণ' বা 'পারিজাত-মঙ্গল' এ শ্রেণীর নাটক। এই নাটকে একুশখানি গান আছে। উড়িষ্যার রায় রামানন্দের 'জগন্নাথবল্লভ' নাটকখানিও 'সঙ্গীত-নাটক' পর্যায়ভুক্ত। এরপর উল্লেখ করা যেতে পারে বাংলা গোরক্ষবিজয় অনুসরণে 'গোরক্ষবিজয় নাট্যম্'। গানে গানে শিষ্য

গোরক্ষনাথ কর্তৃক গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথের উদ্ধার এর উপজীব্য। এই নাটকটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও গানগুলি মৈথিলী-বাংলা মিশ্র ভাষায় রচিত। এছাড়াও গোবিন্দদাস কবিরাজের 'সঙ্গীত-মাধব' নামে আর একটি সংগীত-নাটকের উল্লেখ করা যেতে পারে।

নেপালের রাজদরবারে কিছু কিছু নাটগীতি দেখতে পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাজরোষের ভয়ে অনেক বাঙালীই নেপালে সাহিত্যচর্চার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বাঙালী কবি ধর্মগুপ্ত'-র সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'রামাঙ্ক নাটিকা'-র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নাটকটিতে 'নেওয়ারি' (নেপালী) লিপির পরিবর্তে বাংলা লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। 'ভৈরবানন্দ নাটকম্' এবং 'অভিনব রাঘবানন্দ-নাটকম্' নামে দুখানি সংস্কৃত নাটক মণিকের রচিত। নেপালের রাজা জয়নারায়ণ মল্ল 'পান্ডব-বিজয়' নামে নাটক লিখেছিলেন বলে শোনা যায়।

তৎকালীন বাঙালীরা যে নেপালে গিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছিলেন তার যথার্থ প্রমাণ মেলে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক' গ্রন্থখানিতে। অবশ্য এর আগেও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থে মোট চারখানি নাটগীতি পালার উল্লেখ রয়েছে। পালাগুলি হলো -

১। কালীনাথের - 'বিদ্যাবিলাপ'

২। কৃষ্ণদেবের - 'মহাভারত'

৩। গেনেশের -'রামচরিত্র'

৪। ধনপতিকৃত -'মাধবানল-কামকন্দলা'

ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এর বাইরেও ওই ধরণের আরো কিছু নাটকের উল্লেখ করেছেন।[৬] তালিকা নিম্নোক্তরূপ :

মণিক - 'ভৈরবানন্দ নাটক'
ধর্মগুপ্ত - 'রামায়ণ নাটক'
জ্যোতিরীশ্বর -'ধূর্তসমাগম নাটক'
জগজ্যোতি - 'মুদিতকুবলয়াশ্ব নাটক'
জগৎপ্রকাশ - 'মলয়গন্ধিনী নাটক' ও 'মদনচরিত নাটক'
জিতামিত্র - 'অশ্বমেধ নাটক', মদালসাহরণ নাটক' ও
'গোপীচন্দ্র নাটক'।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি নাটক ও ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি সংগীতমুখ্য নাটকের আলোচনা করা যেতে পারে।

'বিদ্যাবিলাপ' নাটক বিদ্যাসুন্দর কাহিনী অবলম্বনে রচিত। প্রারম্ভে একটি সংস্কৃত শ্লোক, তারপর 'নান্দিমালা'। পরে 'সুত্রে'র (সুত্রধার) প্রবেশ - মহাদেবের বন্দনা-গান ও পুষ্পাঞ্জলি। ক্রমে ক্রমে 'সুত্র' কর্তৃক দেশবন্দনা, রাজবন্দনা সবই গানে পরিবেশিত। তারপর 'সুত্রনটী নিম্নার' অর্থাৎ নটীর প্রবেশ ও পাহাড়িয়া রাগে গান, পরিচারকদের প্রবেশ ও গান। অবশেষে নাটকের আরম্ভ থেকে শেষপর্যন্ত সংগীতের মাধ্যমেই কাহিনী এগিয়েছে।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বাংলা নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এগুলি আরম্ভ-

বিষয়ে সংস্কৃত নাটকের লক্ষণাক্রান্ত হলেও পুরোপুরি নাটক নয়, নাটগীতি পর্যায়ের, যেখানে পাত্র-পাত্রীরা অবতীর্ণ হয়ে গানের মাধ্যমেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে গানের মাধ্যমেই সংলাপ চালিয়ে নাটকের কাহিনী এগিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে সংগীতের ভূমিকা নিরূপণে, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মন্তব্যখানি অনেকখানি সহায়ক হবে বলে মনে করি - ''এই বইগুলি নাটকের আকারে লেখা, কিন্তু আমরা যাহাকে নাটক বলি, এ সেরূপ নাটক নয়। একটি দুটি পাত্র প্রবেশ করিতেছে, আর এক একটি গান করিয়া চলিয়া যাইতেছে।''[৭]

ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'গোপীচন্দ্র নাটক' (Gopichandra Nataka) নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। একথা ঠিক যে, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত নাটকগুলির মতো এই নাটকটি নাটগীতি পর্যায়ভুক্ত নয়। তবুও এতে সংগীতের ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। নাটকটির আরম্ভ শিব-বন্দনা দিয়ে, তারপর রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁর রানীদের প্রবেশ ও গান। সংলাপের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলে নাটকটি। মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক। এর ভাষা বাংলা হলেও গানগুলিতে মৈথিলী বা ব্রজবুলির প্রভাব রয়েছে।

ড. তারাপদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পাঁচটি পালা সম্পর্কে শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতামত উল্লেখ করা যেতে পারে -

''ননীগোপাল-সম্পাদিত নাটক চারটি প্রকৃতই নাটগীত, তাতে গানেরই প্রাধান্য, গদ্য অনুপস্থিত অথবা গৌণ। কিন্তু

'গোপীচন্দ্র নাটকে' গানের প্রাধান্য থাকলেও কিছু কিছু গদ্য সংলাপের ব্যবহারও দেখা যায় এবং সে গদ্য নিতান্ত দায়সারাগোছ নয়।''[৮]

এরপর আসামে অর্থাৎ কামরূপ ও কামতায় দেশীয় ভাষায় যে নাটপালাগুলি রচিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। আসামের প্রখ্যাত ভক্তকবি ও নাট্যকার শঙ্করদেবের একাধিক নাট-পালা ষোড়শ শতক থেকেই ~~প্রচার~~ প্রচারিত হয়েছিল। 'চিহ্নযাত্রা'কে অসমিয়া ভাষায় রচিত প্রথম নাট্যপালা হিসাবে স্বীকার করা হয়। এই পালার শ্রেণী নির্ণয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতান্তর আছে। আমরা 'রুক্মিণীহরণ নাট' পালার সম্পাদক অম্বিকানাথ বোরার মতটি গুরুত্বপূর্ণ মনে করি -

> ''চিহ্নযাত্রা বুলি এখন গ্রন্থ অর্থাৎ নাট লিখা হৈছিল। তাত সূত্রধার আছিল, ~~সূত্র~~ সূত্রধারের বচন আছিল, আন আন ভাওরীয়া সকলর বচন আছিল, আরু কিছুমান কথা গীততে সুমাই দিয়া বুলি লিখিছে অর্থাৎ যিখিনি কথা ভাওরীয়ার বচনর দ্বারা প্রকাশ নেপালে, সেইখিনি গীতর দ্বারা প্রকাশ করাইছিল।''[৯]

বিশ্লেষণে আমরা দেখি, ওই পালা যথার্থ নাটক নামে চিহ্নিত। তাতে সূত্রধার, সূত্রধারের উক্তি ও অন্যান্য চরিত্রের উক্তি ছিল। কিছু কথা গানে বলা হয়েছে এবং যেখানে অভিনেতার সংলাপে ঘটনার বিকাশ ঘটেনি সেখানে গানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ অসমিয়া ভাষার প্রথম নাটকেও সংগীতের ভূমিকা কম ছিলনা।

শঙ্করদেবের নাটগীতগুলি হলো --'পত্নীপ্রসাদ', 'রুক্মিণীহরণ', 'সীতা-স্বয়ম্বর'(রামবিজয়), 'কালিয়দমন', 'পারিজাত-হরণ' এবং 'রাসলীলা' । এই নাটগীতগুলির পাঁচখানিই কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক । কারও কারও মতে এর বাহিরেও তাঁর আরো নাট্যপালা ছিল ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তৎকালীন কুচবিহার দেশীয় রাজ্যেও নাটগীতির প্রচলন ছিল । ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত কৃত, " A descriptive catalogue of Bengali Manuscripts preserved in the State Library of Cooch Behar(1948) " -

থেকে এ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে । বলাবাহুল্য যে ঐ নাটগীতির ভাষা বাংলা ।

আমরা মনে করি বাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশে রচিত এইসব নাট্যশ্রেণীর রচনাই সেই ব্যবহৃত সূত্র বা missing link যার দ্বারা অন্তত দুশো বছর নাট্যচর্চার বিস্ময়কর অনুপস্থিতি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ।

৬৩

বাংলাদেশে চৈতন্যদেবের পর এবং অষ্টাদশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নাট-যাত্রার বিশেষ নমুনা পাওয়া যায় না । একথা বলা চলে, বাংলার নাটগীতি ও যাত্রাগানের যথার্থ আরম্ভ অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে । এর পূর্বে যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া যায় তা মূলত

কীর্তন গান ও কথকতার পুঁথি। এগুলির মধ্যে গান, X কথকতা ও সংলাপের মিশ্ররীতি লক্ষ্য করা যায়। এগুলিকে সাধারণভাবে 'xxxxxxxx 'কৃষ্ণযাত্রা' বা 'কৃষ্ণযাত্রা পালা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত হরিদাস পালিত মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত 'দুর্জয়মান' পালা পুঁথির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই পুঁথিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত আছে। কোনরূপ নম্বর নেই। এই পুঁথিটি বিচার করলে দেখা যায় যে, এটি মূলত কীর্তন গানের পুঁথি এবং মাঝে মাঝে মহাজনপদগুলিকে ভেঙে গদ্যসংলাপের ঢঙে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন -

'' পদ

তুমি যদি লম্পট লোভ সম
    পিরিতি করিতে নাহি জান।
হাত কোন তুমি আপন কৈছে
    বিলায়ব আন।।

ভান

তুমি লম্পট লোহ সম।
  তুমি না জান পীরিতের মর্ম।''

এই প্রসঙ্গে দুর্গাদাস বিশ্বাস সংকলিত 'সংকীর্তন, ১ম খন্ড' থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে :

শ্রীরাধিকা বলছেন -

''এই না কাছে আছে বঁধু ঘুমে অচেতন,
দরশনে বড় শুভ যোগ এখন।
মনের মতন আজ ও-বিধু-বদন
নিরখি জুড়াব জীবন নয়ন।।'' ইত্যাদি।

বলতে বলতে শ্রীরাধিকা ভাবে মূর্ছিত হয়ে পড়লে, গায়ক 'উপজ' সৃষ্টি করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছেন -

''উপজ

কথা কহিতে কহিতে রাই, আঁখিতে পলক নাই,
পুলকে ঢলিয়া পড়ে গায় ।
তাহে ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর দেখিয়ে যামিনী ভোর
মনোচোর মাগিল বিদায় ।'' ইত্যাদি ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ৬২১০-সংখ্যক পুঁথির উল্লেখও এই প্রসঙ্গে করা প্রয়োজন । পালার নাম 'নিমাইসন্ন্যাস' ।

''অথ নিমাইসন্যাষ ।
যেজন ভকত হও মোন দিয়া মোন ।
যে রূপে করিলা প্রভু সন্যাষ গ্রহণ ।।

. . .

ভারতির সঙ্গে প্রভু কহিলা তত্ত্ববাণী ।
নিকটে থাকিয়া তা শুনিল মালিয়ানী ।।

ধুয়া

একদিন সচিমাতা গ্রিহকর্ম করেন ।
হেনকালে মালিয়ানি আসিলা সত্তরে ।।

কথা

তখনে মালিয়ানী কহিতেছেন ও সচিমাতা আমি
গঙ্গাতটে শুনিয়াছি গো: তোমার গৌর তোকে কাঙাল
করিয়া নিশাভাগে ছাড়িয়া যাবেগ ।

ধুয়া

তোমারে অনাথ করি :
ছাড়িয়া যাবে গৌরহরী ।

কথা

তখন সচি বলে আমার গৌরাঙ্গ অনাথ করিয়া ছাড়িয়া জাবে বৃন্দাবন তে গো:

ধুয়া

গৌর যদি ছাড়ে মোরে :
কিরূপে রহিব ঘরে ।। :
গৌর মোরে ছাড়িয়া গেলে : একে কালে কাঙ্গালিনী
করে জারে:

কথা

তখন সচিমাতা রোদন করিতেছেন : আমারে অনাত করিয়া সন্যাসেতে জাবেগো : ওরে নদিয়াবাসি গো :

ধুয়া

নদিয়া ছাড়িয়া নিমাই জাবে:
দিবসে আন্ধার হবে ।। :

. . .

কথা

কান্দিয়া সচিমাতা কহিতেছে । :
তোমারর জেষ্ঠ ভাই ছিল বিশ্বরূপ নাম ।
সেই ঘরে ছাড়িয়া গেল বিধি হইল বাম ।। :''

এইভাবেই পালাটি এগিয়েছে । পালাটির শৈলীর তিনটি ভাগ আমরা দেখতে পাই । পদ, কথা ও ধুয়া । এখানে পদ অর্থে মূল সংগীত । পালার ভিতরে পর্পর সংগীতগুলি সাজানো থাকে । এবং কোন পদে গল্প বা পরিস্থিতির বর্ণনা, কোন পদে কথোপকথন তা বুঝিয়ে দেবার জন্য কীর্তনীয়া কথার সাহায্য নেন । ধুয়ার সংযোজন ব্যাখ্যার জন্যও কথার প্রয়োগ হয়েছে । এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই শৈলীর সঙ্গে আমরা যাত্রার শৈলীর সাদৃশ্য দেখতে পাই ।

এরপর পরিণত স্তরের কীর্তন-পালায় কথার অংশ আরো বেড়ে যায়। আদিতে গান পদাবলী কীর্তনে প্রধান স্থান দখল করে রাখলেও পরবর্তীকালে সেই পদাবলীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে গিয়ে গায়ককে অনেকখানি কথা ও কাহিনীর সাহায্য নিতে হয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত একটি 'নিমাই সন্ন্যাস' পালার উল্লেখ করা যেতে পারে।

উল্লিখিত পালাটিতে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ পর্যন্ত কাহিনী কথা ও সংলাপের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছে। প্রথমদিকে গল্পচ্ছলে যে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, শ্রী-চৈতন্যের গৃহত্যাগের পর সে রীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে পদাবলীর পর পদাবলী গেয়ে পরিস্থিতির ব্যাখ্যা চলতে লাগলো।

কিছু নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে :

''কথা - মধ্যাহ্নকালে শচীর দ্বারে ভারতী এসে উপস্থিত হয়ে বলতিছেন, শচী মা ভিক্ষাং দেহী। শচীমা কেশব ভারতীর গলা শুনে বলতিছেন কি সর্বনাশ, হারে নিমাই অতিথিকে বলগে যা, ঠাকুর আপনি অন্যত্র গমন করুন।

তা শুনে নিমাই কি বলতিছেন ? নিমাই বলতিছেন, - একি বললে মা, গিরস্থর ধর্মই অতিথ সৎকাজ করা। যদি ঘরে কিছু নাও থাকে ভিক্ষে করে এনেও অতিথ সেবা করতি হয়। এসময় কি অতিথ বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে ?'' এমনিভাবে নিমাই xxx ও শচীমাতার উক্তি - প্রত্যুক্তিতে এগিয়ে চলে কাহিনী। তারপর -''ভারতী গঙ্গাস্নানে গেলেন। ভারতী xxxxxxxxx গঙ্গাস্নান করতিছেন, নিমাই পশ্চাতে

দাঁড়ায়ে যোড় হাতে বলতিছেন, গুরুদেব প্রণমামি । তখন ভারতী চক্ষু খুলে দেখতি পেয়েছেন :

পদ অমনি ঢেলে দিল,
কর্ণমূলে ঢেলে দিল,
নিমাই কাঁদিতে লাগিল,
কৃষ্ণ কোথা আছ বলে কাঁদিতে লাগিল ।''

এরপর কিছু কথা, তারপর পদ, তারপর কথা, তারপর পদ । এইভাবেই কথা ও পদের সাহায্যে এগিয়ে চলে পালা ।

কীর্তন ও যাত্রার মধ্যবর্তী স্তর ঢপ্‌-কীর্তন । ঢপের মধ্যে যাত্রার সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠেছে । ঢপ-কীর্তনকে একক অভিনয় না করিয়ে পাত্র-পাত্রীদের দ্বারা অভিনয় করালেই যাত্রার পর্যায়ে পড়ে । এই প্রসঙ্গে মধুকানের ঢপ্‌-কীর্তন থেকে কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে । পালার নাম 'কলঙ্কভঞ্জন' ।

''কলঙ্ক ভঞ্জন
পালা আরম্ভ ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমে গৌরবিণী । তাঁহাকে গুরুজনগণ শ্যাম কলঙ্কিনী বলে গঞ্জনা দেয়," ইত্যাদি কথকতা । এবং এর পরই ধুয়া :

'' ধুয়া
বাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধর ।
মনের সাধ পুরাতে পার ।।

কথা - তখন শ্রীরাধিকা এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া নির্জন কক্ষে বসলেন ।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে সঙ্গে লয়ে রাধাকুঞ্জের তীরে গিয়ে
...ও শ্রীরাধিকার আগমন হয় নাই, অভিসারের সময় অতিবাহিত
...। তখন সুবলকে সখেদে শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, (সুবল,) রাধা বিনা
প্রাণ বাঁচে না। এই বলে শ্রীকৃষ্ণ সুবলকে বললেন -

ধুয়া

এইস্থানে বস তুমি।
বৃন্দার কুঞ্জে যাই আমি।।

কথা - তখন কাঙালের ন্যায় বৃন্দের মদনকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে -

শ্রীকৃষ্ণ - বৃন্দে অদ্য অভিসারের সময় বয়ে গেছে। আমার প্রাণ-বল্লভা
রাধিকা এখনও এলেন না কেন?

নয়নের তারা আমার রাধিকা সুন্দরী।
একতিল না হেরিলে রহিতে না পারি।।

অতএব তুমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি উত্তর দেন।

বৃন্দা - যাও যাও আমি নিত্য নিত্য গিয়ে ওসব কথার জন্য সাধ্য-সাধনা
করতে পারব না।

ধুয়া - তোমরা মান করবে দুজনায়।
আমার সাধিতে প্রাণ যে যায়।।

শ্রীকৃষ্ণ - বৃন্দে তুমি আমার এই দুঃখের সময় এমন কথা বললে? অতএব
তুমি এরূপ বলো না।

সুর - তুমি বিনা কে মোর আছে।
বল তোমা বই যাব কার কাছে।।''

এইভাবেই উক্তি--প্রত্যুক্তি ও সুর-সহযোগে পালাটি অগ্রসর হয়েছে।

তারপরেই গানের উল্লেখ -

'' গীত

রাগিনী - পরজ । তাল - ঢিমাতেতালা কাওয়ালী ।

প্রাণ দিতে চাও আমায় (প্যারীত বেঁধেছে হৃদয়)

তবে যে দাও যারে তারে কথায় আর কথায় ।।''

পুনরায় বৃন্দা ও কৃষ্ণের উক্তি--প্রত্যুক্তি ও গান এবং শ্রীমতী ও বৃন্দার উক্তি--প্রত্যুক্তি ও গান - এইভাবেই চলে পালাটি ।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কীর্তন ভেঙে যে ঢপ-কীর্তনের সৃষ্টি তা অনেকাংশেই যাত্রার সমগোত্রীয় ।

আমাদের আলোচনায় পাঁচালীর রূপতত্ত্ব নিয়ে কিছু আলোচনার অবকাশ রয়েছে । পাঁচালীতে সংগীতের কী ভূমিকা ছিল এবং পরবর্তীতে নাটকে তার প্রভাব কতটা পড়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে । মোটামুটিভাবে বলা যায়, গীতসম্বলিত ও সুরসংযোগে বিবৃতিমূলক আখ্যানকাব্যই পাঁচালী নামে অভিহিত । মধ্যযুগীয় সাহিত্যে - রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদি ধারাগুলি পাঁচালী শ্রেণীভুক্ত ।

বিভিন্ন সময়ে পাঁচালীর বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে । প্রথম দিকে পাঁচালীর ছিল পাঁচটি অঙ্গ । যেমন - পদচারণা, ভাবকালি, নাচাড়ি, বৈঠকী ও দাঁড়াকবি । পরবর্তীকালে গঙ্গারাম নস্কর ও গুরুদুম্বা এর কিছু সংস্কার সাধন করেন । উনবিংশ শতকে দাশরথি রায়ের হাতে এই পাঁচালীর সম্পূর্ণ সংস্কার সাধিত হয় । পাঁচালী তখন অষ্টাংগ হয়ে পড়ে । যেমন - (১) সাজ-বাজানো, (২) দেব-দেবী-বিষয়ক গীতি,

(৩) কাটনদার কর্তৃক গদ্যে ও পদ্যে ছন্দে কথায় আবৃত্তি, (৪)কোরাস বা সমবেত-সংগীত ও (৫) প্রতিদ্বন্দ্বীদলেরও উক্ত- অংশের অনুসরণ, (৬) প্রথমে প্রথম দলের পালাগান(সাধারণত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক - 'সখীসংবাদ','মান', 'মাথুর', 'গোষ্ঠ', 'কলঙ্কভঞ্জন' ইত্যাদি) (৭) ওই গীতের পর গদ্যপদ্যময় পরপর কয়েকটি ছড়া কেটে গান ও প্রস্থান। (৮) প্রতিদ্বন্দ্বীদলের ঠিকা - একইভাবে পালার গদ্য,পদ্য ও ছড়া কেটে সংগীত। পাঁচালী গানের বিষয়বস্তু অনুসারে একে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। প্রথমভাগে আমরা দেবমহিমামূলক ও ভক্তিরসাত্মক বিষয়বস্তু নির্ভর পাঁচালী গান পাই এবং দ্বিতীয়ভাগে রয়েছে প্রণয়কাহিনীমূলক ও আদিরসাত্মক বিষয়বস্তু।

প্রথমভাগে রয়েছে 'রামলীলা-পাঁচালী', 'কৃষ্ণলীলা পাঁচালী', 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী' - ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ভাগে আমরা 'বিদ্যাসুন্দর পাঁচালী', দৌলতকাজীর 'লোর-চন্দ্রানী', আলাওলের 'পদ্মাবতী', প্রভৃতি পাই।

এখানে উল্লেখের প্রয়োজন যে পাঁচালী শুধু গীত নয়, গীতাভিনয়; একক অভিনয় নয়, একটি সম্প্রদায়ের অভিনয় এতে পাঠ অপেক্ষা গানের প্রাধান্যই অধিক।

এই প্রসঙ্গে ড. জয়নারায়ণ ঘোষাল তাঁর 'করুণানিধান বিলাস'-এ ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকের দৃশ্যকাব্যগুলি বোঝাতে গিয়ে যা বলেছেন, তা উল্লেখ করা যেতে পারে -

''পাঁচালী অনেক ভাঁতি রামায়ণ সুর ।
কথকতা তরজাতে সারিতে প্রচুর ।''

অর্থাৎ, রামায়ণ, কথকতা, তরজা, শাড়ি(সারী) গানে পাঁচালী-গান গাওয়া হতো ।

দাশরথি রায়কে নব্য-পাঁচালীর জনক বলা হয়ে থাকে । কিন্তু তাঁর পূর্বেও পাঁচালী গান দেখা যায় । তাঁর পূর্ববর্তী পাঁচালীকারদের মধ্যে গঙ্গারাম নস্কর, গুরুদুম্বা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাসের নামও স্মরণীয় । লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস দেব-দেবী বিষয়বহির্ভূত বিষয় নিয়েও পাঁচালী রচনা করেছেন । 'শতরঞ্জের পাঁচালী' - তার নমুনা । তিনি 'লকে কানা' নামেও পরিচিত ছিলেন ।

ঠাকুরদাস দত্ত মহাশয়ও কিছু পাঁচালী রচনা করেছিলেন । তাঁর রচিত পালাগুলি - 'শিব-বিবাহ', 'মার্কণ্ডেয় চণ্ডী', 'রামের দেশাগমন', 'পারিজাত হরণ', 'অক্রূর আগমন', 'দান', 'মান', 'মাথুর', 'ধ্রুবচরিত্র' প্রভৃতি । এই পালাগুলির গানের কিছু উল্লেখ করেছেন ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় । গানগুলির ভাষা ও ভঙ্গি উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে । তিনি পাঁচালী গানে বিশুদ্ধ মার্গরীতির অনুসরণ করেছিলেন বলে শোনা যায় ।

দাশরথি রায়ের পাঁচালীর যে সর্ববৃহৎ ও প্রামাণিক সংস্করণ সম্পাদিত করেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় তাতে ৬৪টি পালায় সংগীত-সংখ্যা ৭৫৬ । এ ছাড়াও আসরে গাইবার জন্য দাশরথি রায় বহু ছুট্ গীত রচনা করেছেন, যেগুলি পালার সহিত সম্পর্ক বর্জিত । পালার

প্রারম্ভে বন্দনাদি করবার জন্য এই সমস্ত ছুট্ গীত ব্যবহৃত হতো। গৌরলাল দে এবং হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এই প্রকার ১০টি ছুট্ গীতের সংখ্যা দিয়েছেন। কিছু মতদ্বৈততা আছে বলে উভয়ের সংগীত-সংখ্যার বিচার করে বলা যায় যে, দাশরথি রায়ের ছুট্ গীত সহ সংগীত-সংখ্যা ৮৪০টি।

দাশরথি রায় তাঁর বিভিন্ন গানে ১১টি সুর ব্যবহার করেছেন এবং বিভিন্ন তাল ব্যবহারের সংখ্যা ২৫।

পাঁচালীর প্রধানতম অঙ্গ গান। দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালী-গুলিতে গান কিভাবে ব্যবহার করেছেন - আলোচনা করে দেখা যেতে পারে।

পাঁচালীতে প্রারম্ভিক সংগীত অপরিহার্য না হলেও, আরম্ভে বন্দনামূলক সংগীতের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কোন কোনটিতে এগুলি পালার বিষয়সূচকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে - আবার কোনগুলিতে ছুট্ সংগীতরূপে ব্যবহৃত। দাশরথি রায়ের ৬২টি পালা বন্দনাগীতি দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। কেবলমাত্র 'দক্ষযজ্ঞ' ও 'বামনভিক্ষা' পালাদুটিতে প্রারম্ভ-সংগীত ব্যবহৃত হয়েছে। অপর দিকে ৬৪টি পালার প্রত্যেকটিতে অন্ত্য-সংগীত রয়েছে। পালায় বিভিন্ন চরিত্রের(প্রধান, অপ্রধান, গণচরিত্র) পাত্র-পাত্রীদের মুখে ৬১২খানি গান প্রযুক্ত হয়েছে। স্ত্রী-চরিত্র, পুরুষ চরিত্র, দেব-দেবী ও পৌরাণিক চরিত্রের মুখে গান দেওয়া হয়েছে। এই সব গানের বিষয়বস্তুও ব্যাপক - বর্ণনামূলক, ভক্তি-মূলক, অধ্যাত্মতত্ত্ব - নিরূপক, রূপ-বর্ণনামূলক, সখ্যপ্রেম, রূপক প্রভৃতি।

এ ছাড়াও লঘু-সংগীত ও সরস গানের ব্যবহারও বাদ থাকেনি।

গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল বলে জানা যায়। কালকে অতিক্রম করে এখনও অনেক গানের জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন রয়েছে। কিছু গানের উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) ''দোষ কারো নয় গো মা ''

(২)''গিরি গৌরী আমার এসেছিল''

(৩) ''ধনি আমি কেবল নিদানে''

(৪) ''তেমনি সুখ সজনি লো, বিচ্ছেদের পর পিরীতখানি''

এরপর পরবর্তীকালে পাঁচালীকার হিসাবে রসিক রায়, সীতারাম মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু প্রভৃতির নাম পাই। পাঁচালীতে সংগীতের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য দাশরথি রায়ের আলোচনার পর স্বতন্ত্রভাবে অন্য পাঁচালীকারদের আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তবে মনোমোহন বসু তাঁর পাঁচালীতে দাঁড়াকবি ও হাফ-আখড়াইয়ের রীতিতে কিছু নূতনত্ব এনেছিলেন, একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

পাঁচালী থেকে কবিগানের উৎপত্তি একথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পাঁচালীর দাঁড়াকবি ও কাটনদারের অনুকরণেই কবিগান সৃষ্ট একথা বলা যেতে পারে। যদিও কবিগান নাটক পর্যায়ভুক্ত নয়, তবুও পরবর্তীতে নাট্যাভিনয়ের পূর্বরূপ হিসাবে কিছু আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

প্রায় দুশো বছর ধরে গ্রাম বাংলা, শহর ও শহরতলীর জনসাধারণের আনন্দ যুগিয়েছে কবিগান। বিশেষত অষ্টাদশ শতকের

শেষ দিক থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কবিগান শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের কাছেই খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল ।

কবিগান বিশ্লেষণ করলে আমরা এর চারটি পর্যায়ক্রমিক অবস্থা দেখতে পাই । যেমন - (১) দেবী-বিষয়ক গীত (২) সখী-সংবাদ (৩) বিরহ এবং (৪) খেউর-লহর । এবার বিভিন্ন অংশগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক ।

(১) দেবী-বিষয়ক গীত - মালসী, ডাক-মালসী, আগমনী প্রভৃতি গান এই পর্যায়ভুক্ত ।

(২) সখী-সংবাদ - মুখ্যত মাথুর লীলা বোঝায় । শ্রীরাধা বা ব্রজগোপীদের কাছ থেকে দূতীরূপে কোন সখীর (সাধারণত বৃন্দার) মথুরায় গমন ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাক্যালাপ এর অন্তর্ভুক্ত ।

(৩) বিরহ - এই পর্যায়ে আছে শিষ্ট ও ভদ্ররুচির নর-নারীর প্রেমের কথা ।

(৪) খেউর-লহর । এই পর্যায়ে দেখতে পাওয়া যায় ছোট ছোট ভাগে উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক গীত ।

কবিগানে কতগুলি ক্রম মানা হতো । ক্রমগুলি হলো - চিতেন, পারন, পর-চিতেন, ফুকা, মেলতা, মহড়া প্রভৃতি ।

দেবী-বিষয়ক গীত ছাড়া অন্যান্য অংশে অর্থাৎ সখী-সংবাদ বিরহ ও খেউর-লহরে গান চলতো প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে - একেই বলা হতো চাপান-কাটান বা উতোর । এই চাপান-কাটান বা উতোর-ই ছিল

কবিগানের মূল আকর্ষণ। একদল গাওনা করতে এসে চাপান দিত, অপর দল এসে উত্তর দিত। কেউ কেউ এই বৈশিষ্ট্যের জন্য একে 'কবিতা-সংগীত-সংগ্রাম' বলে উল্লেখ করেছেন।

এই সময়কালে বহু কবিওয়ালার কথা আমরা জানতে পারি। রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, রঘুনাথ দাস, রাম বসু, গোঁজলা গুই, এ্যান্টনী-ফিরিঙ্গি, ভোলা ময়রা, ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, মনোমোহন বসু প্রভৃতি।

হরু ঠাকুর রচিত একটি কবিগানের নমুনা দেখিয়ে কবিগানের স্বরূপ ও সংগীত-প্রয়োগ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে যে কবিগানের চারটি পর্যায়। এখানে আমরা সখী-সংবাদ পর্যায়ের কিছু নমুনা উল্লেখ করছি :

''মহড়া - একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত
কে রথ আনিল গোকুলে।
. . .
খাদ - শ্যাম ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে,
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী
. . .
১ চিতেন - নিশাভাগ নিশি, যথা বাজে বাঁশী, আসি গোপী সকলে।
পাড়ন - দিয়ে বিসর্জন [illegible] কুলশীলে।
ফুকা - এতেই হলেম দোষী তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
মেলতা - এই দোষে কি হে ত্যজিলে।।
অন্তরা - শ্যাম যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি
থাক হরি যথা সুখ পাও।
. . .
২ চিতেন - জনমের মত শ্রীচরণ দুখানি হেরি হে নয়নে শ্রীহরি।

পাড়ন - আর XXXXX হেরিব আশা না করি ।।

ফুকা - হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার

মেলতা - হৃদে বজ্র হানি চলিলে ।।''

আখড়াই, হাফ-আখড়াই, দাঁড়াকবি প্রভৃতি কবিগান-শ্রেণীভুক্ত হলেও এদের মধ্যে স্থূল ও কিছু সূক্ষ্ম ভেদ রয়েছে বলে স্বতন্ত্র আলোচনার কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি । অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই ভেদগুলির কোন সীমারেখা নেই । বিশেষ বিশেষ দলের ক্ষেত্রে এগুলি বিশেষরূপেই প্রকাশিত ।

XXX আখড়াই গানকে উচ্চ-মার্গরীতির অনুসারী বৈঠকী গানরূপে অভিহিত করা হয়েছে । এই গানের উৎপত্তি বিষয়েও নানা মতভেদ রয়েছে । কিন্তু এ বিষয়ের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বলে আমরা উক্ত আলোচনা থেকে বিরত থাকবো । আখড়াই গানের একটি আংশিক নমুনা দেখিয়ে এ আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে ।

১। ভবানী-বিষয়ক :

''বাগেশ্বরী

তুমেকা ভুবনেশ্বরী, সদাশিবে শুভঙ্করী

নিরানন্দে আনন্দদায়িনী । (মা)'' ইত্যাদি ।

২। প্রণয়গীতি :

''বেহাগ

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল । (দেওরা ওরে)

তোমার সাধনা করি সাধ না পুরিল ।।'' ইত্যাদি ।

৩। প্রভাতী :

''ললিত

যামিনী কামিনীবশ হয় কি কখন।(দেওরা ওরে)

হলে কি ও বিধুমুখ হেরি হে মলিন।।'' ইত্যাদি।

হাফ-আখড়াই-এর মুখ্য বিষয় সখী-সংবাদ। এখানেও কবিগানের রীতি অনুযায়ী চিতেন, পরচিতেন, ফুকা, ডবলফুকা, মেলতা, মহড়া প্রভৃতি অনুসৃত হতো। এখানে উল্লেখের প্রয়োজন যে ডবলফুকার ব্যবহার হাফ-আখড়াইতেই দেখা যায়, কবিগানে নেই।

মনোমোহন বসু রচিত হাফ-আখড়াই গানের নমুনা উল্লেখে এই গানের রীতি বোঝানো যেতে পারে :

''১ম সখী-সংবাদ :

মহড়া - দোহাই মহারাজ অবিচার করো না

...

~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

...

~~[illegible]~~

খাদ - আমরা এসেছি আশ্বাসে, পুরাও মনেরি বাসনা।।

ফুকা - সুরমনোলোভা এই রাজসভা চমৎকার

...

ডবলফুকা - দেখিব মাধব আজ কেমন বিচার, ওহে মহারাজ,

...

মেলতা - কলঙ্ক নামেতে যেন রেখো না।

চিতেন - ব্রজেতে বসতি করি আমরা সঙ্গিনী শ্রীরাধার।

ফুকা - শুন গুণমনি রাজনন্দিনী ব্রজেতে,

...

ডবলফুকা - বিচ্ছেদতরঙ্গে রাই ভাসে অনিবার, বিনা কর্ণধার,

...

মেলতা - কি হবে কে জুড়াবে যাতনা।''

এরপর প্রতিপক্ষের উত্তর। তারপর ২য় সখী-সংবাদও একই রীতিতে গাওয়া হতো - অর্থাৎ মহড়া, খাদ, ফুকা, ডবলফুকা, মেলতা, চিতেন, ফুকা, ডবলফুকা ও মেলতা।

এই আলোচনার শেষে খেউড়ের কিছু নিদর্শন রাখা প্রয়োজন মনে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মনোমোহন বসু'র রচনা থেকেই তা উল্লেখ করছি :

''১ম খেউড় :

মহড়া - ওহে মহারাজ, কাঁচুলিতে আঁটা কেন বুক ?
...

তেহরান - লাজে মরে যাই ও প্রাণ তোমারে দেখিয়ে।

চিতেন - ছ মাসে দিলে হে দেখা
ওহে মহারাজ, নব সাজে আজ কোনভাবে সখা।

ফুকা - কেন আচম্বিত, অনুচিত বিপরীত ভাব এমন
...

মেলতা - তোমার কোমর ঘেরা ঘাগরা - কি কৌতুক ?''

এরপর প্রতিপক্ষ দলের উত্তর। তারপর ২য় খেউড় ও উত্তর। এবং একই রীতিতে চলে ৩য় খেউড়।

খেউড় কথাটির মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই গানের স্বরূপটি। প্রতিপক্ষকে হারাবার জন্য রুচিহীন অশ্লীলতায় পরিণত হতো এই সংগীত-সংগ্রাম। মত প্রতিভাধর ব্যক্তি-ই হোন না কেন, তবুও এই গান রচয়িতাদের এ থেকে মুক্তি ছিল না। কারণ ওই খেউড় গান এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, এই গান শোনবার জন্য দলে দলে লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। শ্লীলতা, অশ্লীলতাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে

রঙ্গরসে মেতে উঠতো সবাই, উপভোগ করতো সব বয়সের সবশ্রেণীর শ্রোতৃবৃন্দ ।

৭.

যাত্রাকে আমরা পাঁচালীর উন্নতরূপ বলতে পারি । পাঁচালী যদি হয় গীতিপ্রধান তবে যাত্রাকে গীতিবহুল বলা যেতে পারে । অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, 'বস্তু'-র চাইতে 'রসে'-র প্রাধান্যই [এই যাত্রাগানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে] । এই যাত্রাভিনয়ের 'রসপূর্ণ' সংগীতে শ্রোতা আজও বিমুগ্ধ হয় - আজও বাঙালী তাই যাত্রাগানকে ভোলেনি । তাই আমরা দেখি, সিনেমা, থিয়েটারের পাশাপাশি সমান তালে এগিয়ে চলেছে যাত্রাগান । সিনেমা, থিয়েটার এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হলেও - যাত্রাগানের মনোরঞ্জনের ক্ষমতা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত । শহর, শহরতলী ছাড়িয়ে গ্রামে গঞ্জে আজও এর সমান চাহিদা । লোকরঞ্জনের, অবসরবিনোদনের সবচাইতে সহজ ও উপভোগ্য মাধ্যম এই যাত্রাগান । অবশ্য আমরা বর্তমানে যাত্রাগানের যে রূপ দেখতে পাই, আমাদের উল্লিখিত যাত্রা তা থেকে কিছুটা ভিন্ন । আলোচনাতেই তা পরিস্ফুট হবে ।

যাত্রাগান স্বাভাবিক ভাবেই সংগীতবহুল । নাটকের সঙ্গে এখানেই এর প্রধান পার্থক্য । বলাবাহুল্য, ইদানীংকালের যাত্রাগানেও

সংগীতের এই ব্যাপক ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রয়েছে ।

যাত্রার যথার্থ সূচনা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ । এর আগেও এর অস্তিত্ব ছিল বলে অনেকের অভিমত । যাত্রার বিষয়বস্তু অনুসারে যাত্রাভিনয়কে মোট ছ'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ।

(১) কৃষ্ণলীলার বিষয় নিয়ে - 'কৃষ্ণযাত্রা'

(২) রামলীলাকে কেন্দ্র করে - 'রামযাত্রা'

(৩) চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে - 'চৈতন্যযাত্রা'

(৪) চণ্ডী ও মনসার কাহিনী নিয়ে - 'চণ্ডীযাত্রা'

(৫) বিদ্যাসুন্দর পালার অনুবর্তন

(৬) স্বদেশী যাত্রা

এছাড়াও সখের যাত্রাগানের একটি পৃথক শ্রেণী নির্দেশ করা নিতান্ত অসংগত নয় ।

কৃষ্ণযাত্রাকেই যাত্রার প্রাথমিক রূপ বলে ধরা হয়ে থাকে । এই প্রসঙ্গে ড. সুশীল কুমার দে মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ্য -

"The earliest yatra of which we have any mention relate to such themes, and was known technically and universally as the Krishna-Yatra." ১০

কৃষ্ণলীলার বিষয়গুলি যাত্রায় গৃহীত হয়ে কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন পালা নামে পরিচিত হলো । পরবর্তীকালে কালিয়দমন পালা এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল যে, ওই যাত্রার দলগুলিকে 'কালীদমনে' বলা হতো । কৃষ্ণযাত্রার পালাকাররূপে শিশুরাম

অধিকারী, শ্রীদাম ও সুবল অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী, প্রেমচাঁদ ও বদন অধিকারীর নাম উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। কৃষ্ণযাত্রায় সংগীতবাহুল্য কিছু কমিয়ে, গানের সঙ্গে কথা ও গদ্যসংলাপ যুক্ত করে কিছুটা নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করেছিলেন পরমানন্দ দাস। পরমানন্দ দাস নিজে দূতী সেজে গানে গানে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন। বিশেষ করে তাঁর 'তুক্কো'গুলি বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল।

কৃষ্ণযাত্রার আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রেমচাঁদ অধিকারীর শিষ্য বদন অধিকারীর নাম উল্লেখের প্রয়োজন। তিনি নিজে ছিলেন সুগায়ক। তিনি 'তুক্কো'-র রূপ আরো উন্নত করেছিলেন। বদন অধিকারীর দু-একটি গানের নমুনা দেওয়া যেতে পারে :

(১) ''যাও যাও কালাচাঁদ, হেথা এসো না।''

(২) ''আমার অঙ্গনে আতব মব রসিয়ারে
কব কব কব কথা, কথা কব নাগো।''

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দ অধিকারী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। গোবিন্দ অধিকারী ছিলেন যাত্রার স্বত্বাধিকারী, পালাগান-লেখক, পরিচালক, প্রধান অভিনেতা, সংগীত-রচনাকার ও সুরকার। তিনি 'ঘটকালি', প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে সংলাপের সাহায্যে যাত্রাগানকে অনেকখানি নাটকীয় করে তোলেন। একদিকে সংলাপ অপরদিকে কীর্তনাঙ্গের গান যুক্ত করে কৃষ্ণযাত্রাকে তিনি আপামর জনসাধারণের উপভোগ্য করে তুললেন। তাঁর রচিত গান কালের সীমাকে অতিক্রম করে আজও শোনা যায়। যেমন-

(১) ''বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের।'' অথবা

(২) ''তোরা যাসনে যাসনে দূতি।''

এখানে উল্লেখ্য যে, 'বাঙালীর-গান' বইখানিতে গোবিন্দ অধিকারীর ৬৪টি গান মুদ্রিত রয়েছে এবং সেই গানগুলির অধিকাংশই তাঁর পালাগুলির অন্তর্ভুক্ত। 'কলঙ্কভঞ্জন', 'মানভঞ্জন', 'মাথুর', 'সুবলমিলন', 'যোগিমিলন', 'প্রভাসমিলন' প্রভৃতি তাঁর রচিত পালাগুলির অন্তর্ভুক্ত।

কৃষ্ণযাত্রা প্রসঙ্গে আরো একজন যাত্রাপালাকারের নাম অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, তিনি হলেন কৃষ্ণকমল গোস্বামী। তাঁর রচিত পালাগুলি - 'স্বপ্নবিলাস', 'দিব্যোন্মাদ রাই' বা 'রাই উন্মাদিনী', 'বিচিত্র-বিলাস', 'কালিয়দমন', 'নিমাই-সন্ন্যাস', 'ভরতমিলন', 'গন্ধর্বমিলন' প্রভৃতি। নিজের পালাগুলির বাইরেও তিনি অন্য অনেকের পালার গান লিখে দিয়েছেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামী কবি, গায়ক ও অভিনেতারূপে প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর গানগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর 'স্বপ্নবিলাস' পালা থেকে একটি গানের নমুনা রাখা যেতে পারে :

''শোন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল কোথা লুকালে।
যেন সে চঞ্চল চাঁদে অঞ্চল ধরে কাঁদে
জননী দে ননী দে ননী বলে।।
নীল কলেবর ধূলায় ধূসর
বিধুমুখে যেন কতই মধুর স্বর,
সঞ্চারিয়ে ডাকে মা বলে।।''

এই পালাটি গানেই সম্পন্ন হয়েছে, গদ্য-সংলাপ নেই বললেই চলে। 'স্বপ্নবিলাস' যথার্থই যাত্রাগান হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণকমল গোস্বামী সংগীতবহুল নাটক রচনা করতেই চেয়েছিলেন। 'বিচিত্র-বিলাস' পালা গানের ভূমিকাংশ উল্লেখেই তা বোঝা যাবে -

''প্রায় চতুর্দশ বৎসর গত হইল, আমি সাধারণের নির্দোষ প্রীতিসাধন মানসে প্রকৃত প্রবন্ধের অনুগত হইয়া প্রথমত: স্বপ্নবিলাস, তৎপর দিব্যোন্মাদ নামে ব্রজলীলার দুইখানি সঙ্গীতবহুল নাটক রচনা করি।''

xx এই প্রসঙ্গে 'দিব্যোন্মাদ রাই' বা 'রাই উন্মাদিনী' সম্পর্কে দীনেশ চন্দ্র সেনের মন্তব্যখানি স্মরণীয় -

''মণিমালার মধ্যে যেমন মধ্যমণি কৌস্তভ, কৃষ্ণকমলের কাব্যগুলির মধ্যে 'রাই উন্মাদিনী' সেইরূপ। 'স্বপ্নবিলাসে'র যে ভাবের উদ্যম 'রাই উন্মাদিনী'-তে তাহার পরিণতি; 'স্বপ্নবিলাসে' ভাবগুলি ~~xxxxx~~ কতকটা অসম্বন্ধ, খুব জমাট বাঁধে নাই, 'রাই উন্মাদিনী'-র অনেক কথাই উহাতে আছে, কিন্তু শেষোক্ত কাব্যে ~~xxxxxx~~ যে নিপুণতা রচনাকৌশল ও ঔজ্জ্বল্য আছে, তাহা 'স্বপ্নবিলাসে' নাই।''[১১]

এই পর্যায়ে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়-এর কৃতিত্বও কম নয়। তিনি সুগায়ক ছিলেন। তিনি নিজে দূতী সেজে আসরে নামতেন। গানে গানে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করতেন। তাঁর সংগীত-মাধুর্যের জন্য তিনি 'কণ্ঠ মহাশয়' বলে খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর যাত্রাপালার সংখ্যা সাত। যথা - 'চণ্ডালিকা উদ্ধার', 'প্রভাসখণ্ড', 'কংস-বধ', 'যযাতির যজ্ঞ', 'মান', 'মাথুর' ও 'কলঙ্কভঞ্জন'। তাঁর পালাগুলিও

সংগীতবহুল ।

এরপর ঊনবিংশ শতকের প্রায় শুরু থেকেই সখের যাত্রার উদ্ভব হয় । এই সময়কালের মধ্যে কামরূপ যাত্রা, নলদময়ন্তী যাত্রা, নন্দবিদায় যাত্রা প্রভৃতি কয়েকপ্রকার যাত্রার কথা আমরা জানতে পারি । ওই সময়ের যাত্রা গানের স্বরূপ সম্বন্ধে 'সমাচার দর্পণের' ২৬শে জানুয়ারী, ১৮২২ সংখ্যা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ।

#। "এ সকল সংক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশ বিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গভঙ্গি পুরঃসর নর্তন কোকিলাদি সুরানুকৃত মধুর সুরে গান নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন আশ্চর্য প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদুমধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা দিগ্‌দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন"

এবার নলদময়ন্তী যাত্রা সম্পর্কে, ১৩ইজুলাই, ১৮২২ সালের 'সমাচার দর্পণে'র অভিমত নেওয়া যাক -

"ঐ যাত্রাতে নলরাজার সং ও দময়ন্তীর সং ও হংসদূতের সং ইত্যাদি নানাবিধ সং আইসে এবং নানাপ্রকার রাগ-রাগিনী সংযুক্ত গান হয়" এই অভিমত থেকেই সংগীত বিষয়ে আমরা ধারণা করে নিতে পারি ।

নলদময়ন্তী যাত্রা ওই সময় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । রাম বসু ওই পালার জন্য যে গান রচনা করেছিলেন, তা খুবই মনোমুগ্ধকর হয়েছিল, যেমন -

(১) ''কেন গো সজনী আমার উড়ু উড়ু করে মন'' এবং

(২) ''নলু নলু নলু বলিস কি তা বলু''

ওই সময়ে মণিপুর থেকে আগত একটি মেয়ে-যাত্রা দলের কথা কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই যাত্রাদলের সংগীত-ব্যবহার ও সংগীত-বিষয়ে কিরূপ পারদর্শিতা ছিল, - তা ১১শে আগস্ট, ১৮২৩, ''সমাচার দর্পণে'র মতামতের কিছু অংশ উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে -

''আশ্চর্য সম্প্রদায় এই স্ত্রীলোকের দল।
...
ইন্দুরেখা সাজি সবে রাসলীলা করে।
পুরুষে বাজায় বাদ্য নারী তাল ধরে।।
...
গুণবতী দিগের গুণ অতি উচ্চস্বরা।
শুনিলে সে মিষ্টস্বর না যায় পাসরা।।
বাদ্য তালে নৃত্য বটে কিন্তু লম্ফ ঝম্ফ।
গান করে জয়দেব মুদ্রা তার কম্প।।''

রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের 'নন্দবিদায়' যাত্রা সব দিক থেকেই খুবই সুনাম অর্জন করেছিল। তাঁর লেখা জনপ্রিয় একটি গান ছিল -

''চোরের বিচার রাজা করে, জানিরে অন্তরে,
রাজা হয়ে চুরি করে তার বিচার কে করে।''

এই সময়ের যাত্রাগান পালাকারদের মধ্যে ঠাকুরদাস দত্তের নাম উল্লেখ্য। তিনি বহু পালাগান লিখে অনেক যাত্রাওয়ালাকে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত পালাগুলি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। 'শ্রীমন্তের মশান' পালায় তাঁর রচিত একটি গান - ''করুণা করুন মে করুণা।'' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

অন্যান্য পালাকারদের মধ্যে নড়াইলের অঘোরনাথ কাব্যতীর্থ, বিষ্ণুপুরের শ্রীবাস দাস, মথুর সাহা, বরিশালের মাহিলাড়া গ্রাম-নিবাসী গোবিন্দ ধূপী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়, যাঁরা যাত্রাগানের পালা-লেখক ও অধিকারী হিসাবে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন।

যশোহর জেলার রায়গ্রামের রসিকলাল চক্রবর্তী, ১২৯৪ বঙ্গাব্দে 'বালক-সঙ্গীত' নামে এক বালক যাত্রার দল তৈরী করেছিলেন। ইনি চৈতন্যলীলার অনুকরণে কিছু কিছু গান রচনা করে নিজের দলের বালকদের দ্বারা গাইয়েছিলেন। বালকদের নৃত্য ও গীতের দ্বারাই তিনি যাত্রা করাতেন যদিও পরবর্তীকালে কিছু সংলাপ যোগ করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য পালার মধ্যে 'মায়ের ছেলে', 'কংসবধ' প্রভৃতি খুবই খ্যাতিলাভ করেছিল।

স্বদেশী যাত্রাগানের সঙ্গে চারণ কবি মুকুন্দ দাসের নাম এক অচ্ছেদ্যতায় জড়িয়ে আছে।

মুকুন্দদাস তাঁর 'স্বদেশী যাত্রা'র মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে স্বদেশ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। বরিশালের অবিসংবাদিত নেতা অশ্বিনী দত্তের প্রেরণায় তিনি স্বদেশী নাটক ও যাত্রাগানের মাধ্যমে সবাইকে রাজনৈতিক দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙবার প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের গান। গানের স্ন মধ্য দিয়ে তিনি স্বাদেশিকতার বাণী এমনভাবে প্রচার করেছিলেন যে, ব্রিটিশ-সিংহের টনক নড়ে উঠেছিল। তিনি দুর্জয় সাহসে সেদিন গেয়েছিলেন -

''কুলার - আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন তো তোমার নয় ।''

কিংবা ''আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরবরবি অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম ।''

অবশেষে সেই স্বাদেশিকতার গানের জন্যই তাঁকে ব্রিটিশ কারাগারে অবরুদ্ধ হতে হয়েছিল ।

শুধু শৃঙ্খল ভাঙবার গানই তিনি গাননি । 'বাবু' xxxxx কালচারের প্রতি তীব্র কটাক্ষ, তথাকথিত 'ভদ্রলোকদের' প্রতি তীব্র ব্যঙ্গও উচ্চারিত হয়েছে তাঁর গানে -

''বাবু বুঝবে কি আর ম'লে ।
কাঁধে গাদা ভূত চেপেছে, একদম দফা সারলে ।''

কিংবা ''এমন করে পরের হাতে
বিকিয়ে দিলি সোনার দেশ ।''

বিদেশী-বর্জনের ডাক দিয়ে তিনি বলেছেন -

''ছেড়ে দাও রেশমি চুড়ি, বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পড়ো না ।''

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের স্বাক্ষর রয়েছে তাঁর গানে -

#1 ''স্বরাজ সেদিন মিলিবে যেদিন চাষার লাগিয়া কাঁদিবে প্রাণ।''

কিংবা ''আগে দু'মুটি ভাতের যোগাড় কর ।''

শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়কে তিনি তাঁর গানে আহ্বান জানিয়েছিলেন -

''মিশে যাও x না চাষীর দলে ।''

সমাজের সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে বৃহৎ কর্মকাণ্ডে যুক্ত করবার জন্য তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়েছেন -

''ডেকে নে তাঁতী, জোলা, কামার, কুমোর, চামার, মুচি ।''

বিচ্ছিন্নভাবে গানগুলির কথা বলা হলেও, বাংলার চারণকবি মুকুন্দ দাস তাঁর বিভিন্ন পালাগুলির মধ্য দিয়েই জাগরণের ডাক পৌঁছে দিয়েছিলেন বাঙালীর প্রতি ঘরে ঘরে । তাঁর পালাগুলি হলো - 'মাতৃপূজা', 'পথ-নারী', 'পল্লী-মেয়ে', 'সমাজ', 'ব্রহ্মবাদিনী', 'কর্মক্ষেত্র' প্রভৃতি ।

রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র, হরিমোহন রায় যাত্রার দল তৈরী করেছিলেন । গান রচনায় তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল । সেকালে তাঁর রচিত গান খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল । যেমন -

''যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী,
রয়েছে বসিয়ে শয্যায় সোহাগিনী ।''

ওই সময়ে যাত্রাগানের জনপ্রিয়তার জন্য বহু যাত্রার দল তৈরী হয়েছিল । পালা-লেখক, সংগীত-রচয়িতা হিসাবে অনেকেই খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন । দলহিসাবে -- মদনমাস্টারের দল, বৈকুণ্ঠের দল, রাধারাণী যাত্রা সম্প্রদায় প্রভৃতি খ্যাত । এ ব্যাপারে তালিকা দীর্ঘ করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা । তবে প্রত্যেক যাত্রাদলেরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল, তা হলো সংগীতের প্রতি অত্যাসক্তি । তার কারণ অনেকটাই জনরুচি । জনগণের চাহিদা মেটাতেই সংগীত-ব্যবহারের এই বৈচিত্র্য ও বিপুলতা । যাত্রাপালাকে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করে তুলবার জন্য সংগীত-ব্যবহার নিয়ে নানা

পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতো সে সময়ে। এককথায় বলা যেতে পারে যে, সংগীত-খ্যাতির ওপরেই নির্ভর করতো যাত্রাদলের খ্যাতি এবং ভবিষ্যৎ।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই বেশ কয়েকটি বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল তৈরী হয়ে গিয়েছিল কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল করেন বলে জানা যায়। তাঁর দলের হয়ে স্ব সেকালের সুপ্রসিদ্ধ ওস্তাদি গায়ক নিমাই মিত্র, তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস ভট্টাচার্য ও কেবলরাম পাল সংগীতে অংশ নিতেন। ঢোল বাজাতেন বিখ্যাত ঢোল বাজিয়ে রামধন মিস্ত্রী।

বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কৈলাশ বারুই-এর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই যাত্রায় তিনি 'ভোরাই' গানের রচয়িতা বলে অনুমিত। গানটি উল্লেখের অপেক্ষা রাখে -

''গা তোলরে নিশি অবসান।''

প্যারীমোহন নিজে বেহালাবাদক ছিলেন এবং তিনি যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল তৈরী করেছিলেন তা অনেকাংশে নাট্যধর্মী। তাঁর যাত্রাপালা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তৎকালীন বহুল প্রচলিত তাঁর পালার একটি গানের উল্লেখ করা যেতে পারে -

''আমি আর যাবনা তোমার সনে, তুমি ফচ্‌কে মেয়ে।
পুরুষ দেখলে অমনি থাকো তার পানেতে চেয়ে।।''

ইতিমধ্যে আরো অনেক বিদ্যাসুন্দর যাত্রার দল তৈরী হয়ে গিয়েছিল। অনেক বারাঙ্গনা গায়িকারাও এতে যোগ দিয়েছিল

বলে প্রমাণ রয়েছে। ধনেখালির এক নিরক্ষর বাগ্‌দী যে গান রচনা করেছিলেন তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে -

''কি শুনাব রূপের কথা, এক মুখে বা বলব কত ?''

বিদ্যাসুন্দর যাত্রার জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে ওই সময়ে বহু যাত্রার দল তৈরী হয়েছিল। কিন্তু ওই সমস্ত দলগুলির মধ্যে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা দলের খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। গোপাল উড়ে সুকণ্ঠের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর পালার গানগুলি এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, ওই সময়ে তাঁর হালকা-চালের গানগুলি 'গোপাল উড়ের টপ্পা' নামে প্রচলিত ছিল।

ভিস্তীওয়ালা, কালুয়া, মেথরানী প্রভৃতির নাচ ও গান দিয়ে শুরু হতো গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, কালাংড়া প্রভৃতি রাগে এবং খেমটা, আড়-খেমটা প্রভৃতি হালকা চালে ওই সমস্ত গান অঙ্গভঙ্গীসহ বা নাচের সঙ্গে গীত হতো। কিছু গানের নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে :

(১) ''বড়া মজাদার দরিয়াকা মিঠা পাণি লিয়া।''

(২) ''আরে কি বাণ মারিলি প্রাণ-সাঁইয়া রে।''

(৩) ''বাবু নগদি রোজগার, সবসে গুলজার।''

এই প্রসঙ্গে বিদ্যা, সুন্দর ও মালিনীর উক্তি-প্রত্যুক্তি-মূলক গানগুলির সবিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন।

মালিনীর গান - ''কে বিদেশী রূপের শশী বসে আছ বকুলমূলে''

বিদ্যার প্রতি সুন্দরের উক্তি - ''বলা যায় কি মুখের কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা।''

সুন্দরের বিদায়মুহূর্তের xxxxx গানটি -

''বিদায় দেহ প্রাণপ্রিয়ে পোহাল ঐ বিভাবরী''

এখানে উল্লেখের প্রয়োজন যে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সেকালের শ্রোতৃসমাজের মনোরঞ্জন করলেও জনপ্রিয়তার প্রলোভনে তার রুচিবিকৃতি যে পর্যায়ে নেমে এসেছিল তা রুচিশীল নাগরিকদের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে।

এবার মতিলাল রায়ের যাত্রাপালায় গান ব্যবহারের দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যাত্রাগানে মতিলাল রায় কিংবদন্তীস্বরূপ। তিনি বহু পালা রচনা করেছেন; অজস্র গান লিখেছিলেন। এতকাল যে ভাঁড়ামী ও অশ্লীলতা আসর মাত্ করে রেখেছিল তা থেকে নূতনতর ভঙ্গীতে, রুচিকর উপায়ে মতিলাল রায় তাকে সর্বজনপ্রিয় ও উপভোগ্য করে তুললেন।

বালক বয়সেই মতিলাল রায়ের প্রতিভার উন্মেষ দেখা যায়। 'তরণীসেন-বধ' তাঁর লেখা প্রথম নাটক বলে স্বীকৃত। এর প্রথম অভিনয়েই এটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় রচনা 'রাম-বনবাস'। এছাড়াও তিনি আরো বহু নাটক লিখেছেন। ওই বিরাট গ্রন্থ-তালিকা সংযোজনের কোন প্রয়োজন আমাদের বর্তমান আলোচনায় নেই বলেই মনে করি।

মতিলাল রায় তাঁর পালাগুলির জন্য আনুমানিক সহস্রাধিক গান লিখেছিলেন। গানের এই বিপুল সংখ্যা বিচার করলে সহজেই অনুমিত হয় যে, তাঁর পালাগুলি মূলত সংগীত-নির্ভর ছিল। ~~পূর্বোক্ত~~

পূর্বাপর পালাগুলির গান ব্যবহারের উদ্দেশ্য অনুধাবন করলেই বোঝা যায় যে, গানগুলি শুধুমাত্র শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যেই রচিত নয়, নাটকে বৈচিত্র্য সৃষ্টিরও সহায়ক। সবচেয়ে বড় কথা, তা ছিল নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর পালাগুলির শুরুতেই বিষয়বস্তু-নির্দেশক গানের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। পালার অভ্যন্তরের গানগুলি একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। গদ্য-সংলাপের পর পরই গদ্য-সংলাপের সারমর্ম শ্রোতৃসাধারণের বোধগম্য করবার জন্য সংগীতের অবতারণা করা হয়েছে। কোন-কোন ক্ষেত্রে কিছুটা গদ্য-সংলাপ হয়ে যাবার পর সংলাপের বাকী অংশটুকু গান দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। এই জাতীয় গানগুলি গদ্য-সংলাপের পরিপূরকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'বিজয়চণ্ডী' গীতাভিনয় থেকে কিছুটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে :

অরণ্যমধ্যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে বসন্ত দাদা বিজয়কে বলছে, ''দাদা আমার যে বড় ক্ষিদে লেগেছে, দাদা আর যে থাকতে পাচ্ছিনে, দাদা, শীগ্‌গির কিছু খাবার এনে দেও, নতুবা বাঁচিনে।'' বসন্তর কথা শেষ না হতেই জুড়ি গান ধরে -

''ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি
সহে না সহে না, ক্ষুধার যাতনা,''

সংগীতের সাহায্যে বসন্তর কান্না দর্শককুলের হৃদয়কে করুণরসে আপ্লুত করে তোলে।

কখনও কখনও জুড়ি মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সুর-তরঙ্গে মনের আকুলতা প্রকাশ করতো সংগীতের মাধ্যমে।

'নিমাই সন্ন্যাস' গীতাভিনয়ে বাসুদেব সার্বভৌম নিমাই-এর প্রকৃত স্বরূপ জানতে পেরে যখন নিমাই-এর কাছে তাঁর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন - তখনই জুড়ির গানের মধ্য দিয়ে বাসুদেবের মনের আর্তি প্রকাশ পেল -

''শুন নিমাই চাঁদ আমার প্রার্থনা হে ।
বঞ্চনা আর ক'রো না ।।''

কোন-কোন ক্ষেত্রে, যেমন - 'যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক' ও'কর্ণবধ'- গীতাভিনয়ে, নেপথ্য-সংগীতের সাহায্যে ব্যক্তি-বিশেষের বিলাপ প্রকাশ করা হয়েছে । 'যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকে' যুধিষ্ঠিরের বিলাপ এবং 'কর্ণবধে' গান্ধারীর বিলাপ-এর উদাহরণ ।

'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ' - গীতাভিনয়ে, আসরে যৌথ-সংগীতের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় । সেখানে প্রমীলার সখীবৃন্দ গান করছে -

''রমণী রতন, পুরুষ কেমন,
দেখিতে যে মন প্রাণ বড় ধায় ।''

কখনও কখনও ভক্তি-মূলক গান পরিবেশিত হয়েছে বালকদের কণ্ঠে । 'পান্ডব নির্বাসন' গীতাভিনয়ে, বালকদের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়েছে -

''অনর্থ চিন্তাতে দিন ব্যর্থ হোল, বল হরি ।''

'শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য' গীতাভিনয়ে নারদের অনুরোধে শবরপুত্র পরজন্ময় ও সদাগতিও গেয়েছে ভক্তি-গীতি -

''হরি হরি বল ভাই, মনের সুখে পরাণ খুলি ।''

কখনও কখনও গানের ব্যবহার নাটকীয় বৈচিত্র্যসৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। নিম্নোক্ত ডুগাই-এর গাওয়া গানটি তারই একটি নমুনা -

''তারা গো, তোমার বাবা শুঁড়ি।''

নাটকীয়তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় কখনও গদ্য-সংলাপের পাশাপাশি সংগীত-সংলাপ দেখা যায়। 'যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞ' গীতাভিনয় থেকে কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে -

''মা মুখ দিয়ে যে কথা বেরুচ্ছে না'' পুত্র তাম্রধ্বজের এ কথার উত্তর আসে মার গানে -

''কাজ কি অন্য কথায়, অভাগিনী মাতায়
যা বলে ঘুচা মনোবেদন।''

তাম্রধ্বজ বলে, ''মাগো। হরি কি আমাকে দয়া করবেন? আমি তাঁর শ্রীঅঙ্গে কত আঘাত করেছি।'' - মাতা কুমুদ্বতী উত্তর দেয় গানে -

''ওরে দেখে তোরে বালক, সেই ত্রিলোক পালক,
দয়া করবেন তিনি দয়ার নিকেতন,''

কখনও কখনও শুধুমাত্র গানেই নাটকীয় সংলাপ রচিত হয়েছে। 'মারুতি মিলন' বা 'কমলে কৃষ্ণ' গীতাভিনয় থেকে দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। অসময়ে দুর্বাসা এসে আতিথ্য গ্রহণ করতে চাইলেন দ্রৌপদীর কাছে। দ্রৌপদী বিপন্ন বোধ করে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন ধ্যানে। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে রক্ষা করতে অবতীর্ণ হয়ে গান ধরলেন -

''কেন সকাতরে দেখি সখী তোরে, আবার কি
যাতনা পেলি'' -

শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়ে যুধিষ্ঠির আনন্দে গেয়ে উঠলেন -

''দেখ ঐ ঐ, আর কোন ভয় নাই, আনন্দে তোমারে জানাই,''

মতিলাল রায়ের পরবর্তীকালে যাত্রা গানে অনেকেই মতিলাল রায়ের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বলা যেতে পারে সংগীত-প্রয়োগের যে পথ-নির্দেশ তিনি রেখে গেছেন, অন্যেরা সেই পথেই পদচারণা করেছেন মাত্র।

মতিলাল রায়ের পর একমাত্র ব্রজমোহন রায়ের যাত্রাগান সম্পর্কে কিছু স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমরা মনে করি। ব্রজমোহন রায় যাত্রা ও পাঁচালী উভয়বিধ রচনাতেই সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর পালাগুলিতে পাঁচালীর ঢং এবং নাটকীয়তা - এ দুইয়েরই মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। শোনা যায় যে তাঁর রচিত গান শুনে নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণগণ খুবই সন্তোষ লাভ করেছিলেন। তাঁর জনপ্রিয় গানের একটি নমুনা -

'' হে শিবশঙ্কর, করুণা কর, করুণা কর''

নাট্যসাহিত্যের পূর্ব পটভূমি এই পর্যন্তই। অতঃপর প্রত্যক্ষভাবে বিদেশী Theatre -এর প্রভাবে বাংলার নাট্যমুকুল প্রধানত অনুবাদের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করবে, সে আলোচনা হবে আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য। বর্তমান আলোচনার ফল XXXXX হিসাবে আমরা বলতে পারি, নাটকের যে উত্তরাধিকার আমাদের রয়েছে বিভিন্ন নাট্যপ্রতিম ও নাট্যলক্ষণাক্রান্ত রচনায়, সেখানে

সংগীতেরই নিঃসংশয়-প্রাধান্য। অতঃপর সেই সাংগীতিক উত্তরাধিকার থিয়েটারের প্রভাবে তার প্রাধান্য রক্ষা করতে পারে কিনা, তাই হবে আমাদের কৌতূহলী অন্বেষণের বিষয়।

১। সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, উত্তরাকাণ্ড। (পৃ. ৬)

২। A.A.Macdonell : A History of Sanskrit Literature(P.290)

৩। A.B.Keith : - The Sanskrit Drama (P. 40)

৪। শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ) (পৃ. ৩১৩-৩১৪)

৫। শ্রী গীত গোবিন্দের গীত : বিশ্ববাণী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৩৫৮।

৬। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা : X (৩য় সংখ্যা, ১৩৬৬) দ্রষ্টব্য।

৭। ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : নেপালে প্রাপ্ত বাংলা নাটক, (ভূমিকা)

৮। শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪র্থ) (পৃ. ৪৪২)।

৯। তদেব পৃ.৪৪৪

১০। Dr. S.K.De : History of Bengali Literature in the 19th Century. (P.408)

১১। শ্রী দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত - কৃষ্ণকমল গ্রন্থাবলী, ভূমিকা, (পৃ. ১৯)।